Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 02 January 2011 12:34 - Last Updated Sunday, 02 January 2011 14:44

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী কোয়ালিশনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধটি নিছক সামরিক বা রাজনৈতিক নয়। সে যুদ্ধটি প্রবল ভাবে হচ্ছে প্রতিটি মুসলিম দেশের সাংস্কৃতিক ময়দানে। সাংস্কৃতিক যুদ্ধের তেমনি একটি উত্তপ্ত রণাঙ্গণ হলো বাংলাদেশ। পাশ্চাত্যের সে কোয়ালিশনে যোগ দিয়েছে আরেক আগ্রাসী দেশ ভারত। শত্রুপক্ষের এ কোয়ালিশন আফগানিস্তান,ইরাক বা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজ যা কিছু করছে, ভারত অবিকল সেটিই করছে বিগত ৬০ বছরের বেশী কাল ধরে করছে অধিকৃত কাশ্মীরের অসহায় মুসলমানদের সাথে। বাংলাদেশের রণাঙ্গনে এ পক্ষটি অতি-উৎসাহী সহযোদ্ধা রূপে পেয়েছে দেশটির বিপুল সংখ্যক সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সাংস্কৃতিক ক্যাডার, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাংবাদিক, আইনজীবী, বিচারপতিসহ বহু সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা।

বিশ্ব-রাজনীতির অঙ্গণ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিদায়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল তাদের পথের কাঁটা এবার দূর হলো। আধিপত্য বিস্তৃত হবে এবার বিশ্বজুড়ে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। আফগানিস্তান ও ইরাকের মত দুইটি দেশ দখলে রাখতেই তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ শেষ হতে ৫ বছর লেগেছিল। কিন্তু বিগত ৭ বছর যুদ্ধ লড়েও মার্কিন নেতৃত্বাধীন ৪০টিরও বেশী দেশের কোয়ালিশ বাহিনী আফগানিস্তানে বিজয় আনতে পারেনি। বরং দ্রুত এগিয়ে চলছে পরাজয়ের দিকে। এখন তারা জান বাঁচিয়ে পালাবার রাস্তা খুঁজছে। পাশ্চাত্যের কাছে এখন এটি সুস্পষ্ট, আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, লেবানন, সোমালিয়ার মত ক্ষুদ্র দেশগুলো দখল করা এবং সেগুলোকে কন্ট্রোলে রাখার সামার্থ্য তাদের নেই। যে প্রতিরোধের মুখে তারা হারতে বসেছে সেটির মূল হাতিয়ার অত্যাধিক যুদ্ধাস্ত্র নয়, জনবল বা অর্থবলও নয়। বরং সেটি কোরআনী দর্শন ও ইসলামের সনাতন জিহাদী সংস্কৃতি। এ দর্শন ও সংস্কৃতিই মুসলমানের জন্য আত্মসমর্পণকে অসম্ভব ও অচিন্তনীয় করে তুলেছে। বরং অতি কাম্য গণ্য হচ্ছে আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই ও শাহাদত। এমন চেতনা এবং এমন সংস্কৃতির বলেই এক কালের মুসলমানেরা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের ন্যায় দুটি বিশ্বশক্তিকে পরাজিত করেছিল। এ যুগেও তারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ও বিশ্বশক্তি রাশিয়াকে পরাজিত করেছে। এবং এখন গলা চেপে ধরেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। আফগান মোজাহিদদের জিহাদ তাই পাল্টে দিচ্ছে বিশ্বরাজনীতির সমীকরণ। কামান, বোমা ও যুদ্ধবিমানের বলে গণহত্যা চালানো যায়। নগর-বন্দরও ধ্বংস করা যায়। কিন্তু সে কামানে বা গোলায় কি দর্শন ও সংস্কৃতির বিনাশও সম্ভব? বরং তাদের আগ্রাসন ও গণহত্যায় প্রতিরোধের সে দর্শন ও সংস্কৃতিই দিন দিন আরো বলবান হচ্ছে। কোন মার্কিনীকে রণাঙ্গণে রাখতে মাথাপিছু প্রায় ১০ লাখ ডলার খরচ হয়। অথচ মুসলমানরা হাজির হচ্ছে নিজ খরচে। তারা শুধু স্বেচ্ছাই অর্থই দিচ্ছে না, প্রাণও দিচ্ছে।

অবস্থা বেগতিক দেখে পাশ্চাত্য এখন ভিন্ন স্ট্রাটেজী নিয়েছে। সেটি শুধু গণহত্যা নয়। নিছক নগর-বন্দর, ঘরবাড়ী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনাশও নয়। বরং সেটি ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি ধ্বংসের। তাই শুরু করেছে প্রকান্ড

Written by ফরিদে মাহবুব কামাল
Sunday, 02 January 2011 12:34 - Last Updated Sunday, 02 January 2011 14:44

আকাররে সাংস্কৃতকি যুদ্ধ□ নতুন এ স্ট্রাটজেীর আলোকে ইরাক ও আফগানস্তিানে তারা শুধু মানুষ হত্যাই করছনো, ঈমান হত্যাতে তৎপর হয়ছে□ এবং সটো শুধু আফগানস্তিান ও ইরাকে সীমতি নয়□ বাংলাদশেরে ন্যায় প্রতটি মুসলমি দশেই এখন একই রূপ সাংস্কৃতকি যুদ্ধরে শকিার□ তবে বাংলাদশে তাদরে অন্যতম টার্গটে হওয়ার কারণ, দশেটতিে ১৫ কোট মুসলমানরে বসবাস□ তলে, গ্যাস বা অন্য কোন খনজি সম্পদরে চয়েে ১৫ কোট জিনসংখ্যার ফ্যাক্টরটই তাদরে কাছে সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ বষিয়□ তলে, গ্যাস বে োয় পরণিত হয়না, কনি্তু মানুষ হয়□ তাই বাংলাদশেী না চাইলওে তাদরে এ আগ্রাসনরে টার্গটে হওয়া থকেে বাঁচার উপার নাই□ শত্রুর লক্ষ্য এখন মুসলমানদরে ঈমানকে হত্যা করা□ ফলে মহা সংকটে এবার শুধু দুনয়িার জীবন নয়, আখরোতরে জীবনও□ কারণ এ যুদ্ধে তারা বজিয়ী হলে বাংলাদশেরে মুসলমান দহে নয়িে বাঁচলওে ঈমান নয়িে বাঁচবনে না□

মার্কনি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মতি্রদরে স্ট্রাটজেী তাই মুসলমানদরে জীবন থকেে জহিাদরে সংস্কৃত বিলিুপ্ত করা□ এবং ভুলয়িে দওেয়া ইসলামমিৌল শকি্ষাকে□ তমেন এক স্ট্রাটজেী নয়িে ব্রটিশিগণ ভারতে আলয়িা মাদ্রাসা খুলছেলি□ ধর্ম-শকি্ষার ছদ্মবশেে মুসলমানদরে দৃষ্ট থিকেে তারা আড়াল করছে জহিাদরে ন্যায় ইসলামরে মূল শকি্ষাকে□ ফলে নরিাপদ হয়ছেলি তাদরে ১৯০ বছররে শাসন□ ইসলামে বরিুদ্ধে সে সফল স্ট্রাটজেী নয়িে তারা আবার ময়দানে নমেছে বাংলাদশে□ এখন সে কাজে বাংলাদশেে ব্যবহার করতে চায় জনগণরে নজিে অর্থে প্রতষ্ঠিতি হাজার হাজার স্কুল-কলজে, মসজদি-মাদ্রাসা ও বশি্ববদি্যালয়□ বাংলাদশেরে ক্ষমতাসীন সকে্যুলারষি্টদরে সহায়তায় ইতমিধ্যই এখন এসব শকি্ষা প্রতষ্ঠিান তাদরে হাতে অধকিৃত□ অধকিৃত দশেরে অধকিাংশ মডিয়িাও□ তারা শুরু হয়ছে ইসলামরে বরিুদ্ধে ব্যাপক মথি্যা-প্রপাগান্ডা□ বলতে চায়, ইসলাম এ যুগে অচল□ যনে ইসলাম শুধু নবীজী (সাঃ)র জামানার লোকদরে জন্যই নাযলি হয়ছেলি□ তারা শরয়িতকে বলছে মানবতা বরিোধী□ সে প্রপাগান্ডাকে ব্যাপকতর করতে বহু টভিি চ্যানলে, অসংখ্য পত্র-পত্রকিার পাশাপাশ পি্রতষি্ঠা করছে হাজার হাজার এনজওি□ এদরে সম্মলিতি প্রচষে্ঠা হলো, নবীজী (সাঃ)র আমলরে ইসলামকে জনগণরে মন থকেে ভুলয়িে দওেয়া□ অথচ ইসলাম থকেে নামায-রোযাকে যমেন আলাদা করা যায় না, তমেনি আলাদা করা যায় না জহিাদকওে□ পবতি্র কোরআনে জহিাদে অংশ নওেয়ার নরি্দশে এসছে বার বার□ সে সব জহিাদে অর্ধকেরে বশেী সাহাবা শহীদ হয়ছেনে□ নবীজী (সাঃ) নজিে রক্তাক্ষয়ী বহু যুদ্ধ লড়ছেনে বহুবার□ ইসলামরে বহু শত্রুকে হত্যা এবং বনু কুরাইজা ও বনু নাযরি ন্যায় ইহুদী বস্তকিে নরি্মূল করা হয়ছে তাঁরই নরি্দশে□ অথচ নবীজী (সাঃ)র সে আপোষহীন নীতওি ইসলামরে সে সংগ্রামী ইতহিাসকে তারা সুপরকিল্পতি ভাবে আড়াল করতে চায়□ নামায-রোযা, হজ-যাকাতরে বাইরওে শকি্ষা, সংস্কৃত, রাজনীত, প্রশাসন, প্রতরিক্ষা ও আইন-আদলতরে সংস্কারে ঈমানদাররে যে গুরুতর দায়ভার রয়ছে সটোকওি ভুলয়িে দতিে চায়□

ইসলামরে আক্বদিা-বশি্বাস ও জহিাদী সংস্কৃত আিজ এভাবইে দশেে দশেে শত্রুপক্ষরে হামলার শকিার□ তাদরে লক্ষ্য, মহান আল্লাহর কোরআনী নরি্দশেরে বরিুদ্ধে মুসলমানদরেকে বদি্রোহী করা□ বাংলাদশেরে মুসলমানদরে জন্য বপিদরে কারণ হলো, এরূপ হামলার মুখে দশেটরি ভৌগলকি সীমান্তরে ন্যায় সাংস্কৃতকি ও আদর্শকি সীমান্ত আজ অরক্ষতি□ অথচ মুসলমানদরে দায়তি্ব শুধু দশেরে সীমান্ত পাহারা দওেয়া নয়□ বরং অতগিুরুত্বপূর্ণ দায়তি্ব হলো, চতেনার রাজ্য পাহারা দওেয়া□ এবং সটো সিুস্থ্য ঈমান-আক্বদিা ও ইসলাম সিংস্কৃত গিড়ে তোলার স্বার্থ□ সীমান্ত পাহারায় অবহলো হলে অনবিার্য হয় পরাজয় ও গোলামী□ তখন বপিন্ন হয় জানমাল ও ইজ্জত-আবরু□ যমেনটি ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে হয়ছেলি□ সে পরাজয়রে ফলইে মুসলমানদরে জীবনে নমেে এসছেলি ১৯০ বছররে ঔপনবিশেকি শাসনরে দাসত্ব□ আর সামরকি ও

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 02 January 2011 12:34 - Last Updated Sunday, 02 January 2011 14:44

রাজনৈতিক পরাজয় একাকী আসে না। আসে অর্থনৈতিক দুর্গতি,আসে দুর্ভিক্ষ। তাই পলাশীর পরাজয়ের পর এসেছিল ছিয়াত্তরের মনত্ত্বর। সে দুর্ভিক্ষে বাংলার বহু লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল, যার অধিকাংশই ছিল মুসলমান। একই ভাবে নেমে এসেছিল ১৯৭৪য়ের দুর্ভিক্ষ। একই রূপ ভয়ানক পরিণতি নেমে আসে সাংস্কৃতিক যুদ্ধে পরাজিত হলে। তখন অসম্ভব হয় সুস্থ্য ঈমান-আক্বিদা নিয়ে বেড়ে উঠা। আর মুসলমানের কাছে জানমালের চেয়ে ঈমান ও আক্বিদার গুরুত্ব কি কম? ঈমান নিয়ে বাঁচা অসম্ভব হলে পণ্ড হয় সমগ্র জীবনের বাঁচাটাই। তখন অনিবার্য করে জাহান্নামের আযাব।

ভৌগলিক সীমান্তকে সুরক্ষিত করার চেয়েও তাই গুরুত্বপূর্ণ হলো ঈমান-আক্বিদার এ সীমান্তকে সুরক্ষিত করা। কারণ শয়তানী শক্তির সবচেয়ে বিনাশী হামলা হয় চেতনার এ মানচিত্রে। এটি অধিকৃত হলে দেশে দখল অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রতিটি ঈমানদারকে তাই সে হামলার বিরুদ্ধে লাগাতর জিহাদ করতে হয়। সশস্ত্র যুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে অন্ধ-বধির বা পঙ্গু ব্যক্তির নিষ্কৃতি আছে। কিন্তু চেতনার মানচিত্রে শয়তানী শক্তির আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক হামলার বিরুদ্ধে যে লাগাতর জিহাদ তা থেকে সামান্য ক্ষণের নিষ্কৃতি নেই। এ জিহাদকেই ইসলামে □জিহাদে আকবর বা শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষেত্রের লড়াইটি আসে তার পরে। বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের আগে তেরোটি বছর ধরে এ জিহাদ লাগাতর চলছে মক্কায়। মুসলমানের চেতনা রাজ্যের ময়দানকে সুরক্ষিত রাখার স্বার্থেই অপরিহার্য হলো মুসলিম ভূমির ভৌগলিক মানচিত্রকে সুরক্ষিত করা।

শুধু ঘরবাঁধা, চাষাবাদ করা বা কলকারখানা গড়াই একটি জনগোষ্টির বেঁচে থাকার জন্য সবকিছু নয়। শুধু পানাহারে জীবন বাঁচে বটে, তাতে ঈমান বাঁচে না। এমন বাঁচার মধ্য দিয়ে সিরাতুল মোস্তাকিমও জোটে না। তখন যা জুটে তা হলো পথভ্রষ্টতা। সে পথভ্রষ্টতায় বিপদাপন্ন হয় আখেরাতের জীবন। ইহকাল ও পরকাল বাঁচাতে এজন্যই একজন চিন্তাশীল মানুষকে বেড়ে উঠতে হয় জীবন-বিধান, মূল্যবোধ, জীবন ও জগত নিয়ে একটি সঠিক ধারণা নিয়ে। মুসলমানের কাছে সে জীবন-বিধান হলো ইসলাম। আর নিত্য দিনের বাঁচবার সে প্রক্রিয়া হলো ইসলামী সংস্কৃতি। নামায-রোযা, হজ-যাকাত এবং জিহাদ হলো একজন ঈমানদারের ইবাদতের প্রক্রিয়া। আর সংস্কৃতি হলো এ জগতে বাঁচবার বা জীবনধার□□□ প্রক্রিয়া। ইসলামি পরিভাষায় এ প্রক্রিয়া হলো তাহজিব। আরবী ভাষায় তাহজিবের অর্থ হলো,ব্যক্তির কর্ম,রুচী, আচার-আচারণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সার্বিক জীবন যাপনের প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ রিফাইনড হয় তথা সুন্দরতম হয়। দিন দিন সুন্দরতম হয় তার রুচীবোধ, আচার-আচরণ, কাজকর্ম ও চরিত্র। তাই মুসলমানের ইবাদত ও সংস্কৃতি-এ দুটোকে পৃথক করা যায় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকাশ পায় আল্লাহতায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া গভীর প্রেরণা ও প্রচেষ্টা। পাখি যেমন তার দুটো ডানার একটিকে হারালে উড়তে পারে না, ঈমানদারও তেমনি আল্লাহর ইবাদত ও ইসলামী সংস্কৃতি একটি হারালে মুসলমান রূপে বেড়ে উঠতে পারে না। তাই মুসলমানগণ যেখানে রাষ্ট্র গড়েছে সেখানে শুধু মসজিদ-মাদ্রাসাই গড়েনি, ইসলামি সংস্কৃতিও গড়েছে। একটির পরিশুদ্ধি ও শক্তি আসে অপরটি থেকে। মোমেনের মূল্যবোধ, রুচীবোধ, পানাহার, পোষাকপরিচ্ছদ, অপরের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তার আল্লাহভীরুতা। অন্যের কল্যাণে সচেষ্ট হয় স্বার্থ চেতনায় নয়, বরং আল্লাহর কাছে প্রিয়তর হওয়ার চেতনায়। এ হলো তার সংস্কৃতি। এমন সংস্কৃতি থেকে সে পায় ইবাদতের স্পিরিট। ঈমানদারে চিন্তা ও কর্মে এভাবেই আসে পবিত্রতা -যা একজন কাফের বা মোনাফিকের জীবনে কল্পনাও করা যায় না। মুসলিম সমাজে এভাবেই আসে শান্তি, শৃঙ্খলা ও শ্লিলতা। অথচ সেক্যুলার সমাজে সেটি আসে না। সেক্যুলার সমাজে যেটি প্রবলতর হয় সেটি পার্থিব স্বার্থ হাসিলের প্রেরণা। মানুষ এখানে জীবনের উপভোগে স্বেচ্ছাচারি হয়। সে স্বেচ্ছারকে তারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার

লেবাস পড়িয়ে জায়েজ করে নিতে চায়। সেক্যুলার সমাজে পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার, সমকামিতা, অশ্লিলতা, মদ্যপাণের ন্যায় নানাবিধ পাপাচার বৈধ্যতা পায় তো জীবন উপভোগের এমন স্বেচ্ছাচারি প্রেরণা থেকেই। ফলে সেক্যুলারিজম যেখানে প্রবলতর হয় সেখানে পাপাচারেও প্লাবন আসে।

মুসলমান ইবাদতে প্রেরণাও পায় তার সংস্কৃতি থেকে। ফলে স্কুল-কলেজে বা মাদ্রাসায় না গিয়েও মুসলিম সমাজে বসবাসকারি যুবক তাই মসজিদে যায়,নামায পড়ে,রোযা রাখে এবং মানুষের কল্যাণ সাধ্যমত চেষ্টাও করে। সীমান্তের প্রতিরিক্ষায় বা শরিয়তের প্রতিষ্ঠায় জিহাদের ময়দানেও হাজির হয়। একাজে শুধু শ্রম-সময়-মেধা নয়, জানমালের কোরবানীও দেয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসার ডিগ্রিধারি না হয়েও নিজেকে বাঁচায় বেপর্দা, ব্যাভিচার, অশ্লিলতা,চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস-কর্ম ও নানা বিধ পাপাচার থেকে। প্রাথমিক কালের মুসলমানগণ যে মানব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার জন্ম দিতে পেরেছিলেন সেটি এজন্য নয় যে সেদিন বড় বড় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসা ছিল। বরং তখন প্রতিটি ঘর পরিণত হয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানে। সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ে গড়ে উঠেছিল ইসলামী সংস্কৃতির বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেদিনের মুসলমানেরা উন্নত মানব রূপে বেড়ে উঠতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশের ন্যায় অধিকাংশ মুসলিম দেশের আজকের বড় সমস্যা এ নয় যে, দেশগুলি অধিকৃত হয়েছে। বরং সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং সে সাথে ভয়ানক বিপদের কারণ হলো,দেশগুলির সাংস্কৃতিক সীমান্ত বিলুপ্ত হয়েছে এবং তা অধিকৃত হয়েছে ইসলামের শত্রুপক্ষের দ্বারা। দেশের সীমান্ত বিলুপ্ত না হলেও মুসলিম দেশগুলির সংস্কৃতির ময়দান শত্রু পক্ষের দখলে গেছে। ফলে এদেশগুলিতেও তাই হচ্ছে যা কাফের কবলিত একটি দেশে হয়ে থাকে। মুসলিম দেশের সংস্কৃতিও পরিনত হয়েছে মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য রূপে গড়া তোলার ইন্সটিটিউশনে। এর ফলে বাংলাদেশের হাজার হাজার মুসলিম সন্তান মসজিদে না গিয়ে হিন্দুদের ন্যায় মঙ্গলপ্রদীপ হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা করছে। কপালে তীলক পড়ছে,থার্টিফাষ্ট নাইটে অশ্লিল নাচগানও করছে। এরাই শয়তানের পক্ষে লড়াকু সৈনিক, তাদের যুদ্ধাংদেহী রূপ শরিয়তের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে।

ব্যক্তির জীবনে প্রতিটি পাপ, প্রতিটি দুর্বৃত্তি, আল্লাহর হুকুমের প্রতিটি অবাধ্যতাই হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা প্রকাশ পায় বেপর্দা, ব্যাভিচার, অশ্লিলতা, নাচগান, মদ্যপান, মাদকাশক্তি,সন্ত্রাস, দূর্নীতি ইত্যাদীর ব্যাপক বৃদ্ধিতে। জাতীয় জীবনে সেটি প্রকাশ পায় দেশে শরিয়তের প্রতিষ্ঠা, সুদমুক্ত ব্যাংক ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশে আল্লাহর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহে সমগ্র বিশ্বমাঝে একবার নয়, ৫ বার শিরোপা পেয়েছে। তাদের সে মহাবিদ্রোহটি ঘটিছে আল্লাহর নির্দেশিত সুনীতি প্রতিষ্ঠার হুকুমের অবাধ্যতা এবং সর্বস্তরে দূর্নীতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এরূপ শিরোপা লাভেই কি বলে দেয় না দেশটির মানুষের জীবনযাত্রার প্রক্রিয়া তথা সংস্কৃতি কতটা অসুস্থ্য ও বিদ্রোহাত্মক? এবং

সাংস্কৃতিক যুদ্ধে ইসলামের পক্ষের শক্তি কতটা পরাজিত?

ব্যক্তির সংস্কৃতির পরিচয় মেলে পোষাক-পরিচ্ছদ বা পানাহার থেকে নয়। বরং কীরূপ দর্শন বা চেতনা নিয়ে সে বাঁচলো তা থেকে। সংস্কৃতির মূল উপাদান হলো এই দর্শন। বস্তুত দর্শনই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে। নাচগান তো পশুপাখিও করে। কিন্তু তাতে কোন দর্শন থাকে না। তাই পশুপাখির নাচে-গানে কোন সমাজই সভ্যতর হয় না,সেখানে সভ্যতাও নির্মিত হয় না। তাই যে সমাজের সংস্কৃতি যতটা দর্শন-শূন্য সে সমাজ ততটাই মানবতা বর্জিত। সে সমাজ তখন ধাবিত হয় পশুত্বের দিকে। দর্শনই নির্ধারণ করে দেয় কে কীভাবে বাঁচবে, কীভাবে পানাহার করবে, কীভাবে জীবন যাপন করবে বা উৎসব করবে সেটি। চেতনার এ ভিন্নতার কারণেই একজন পতিতা, ঘুষখোর, সন্ত্রাসী এবং দুর্বৃত্তের বাঁচার ধরণ,পোষাক-পরিচ্ছদ, পানাহার ও উৎসবের ধরণ ঈমানদারের মত হয় না। মুসলমানের সংস্কৃতি এজন্যই অবিশ্বাসী বা কাফেরের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি বিশেষ বিশ্বাস বা দর্শন জন্ম দেয় একটি বিশেষ রুচী ও সে রুচীভিত্তিক অভ্যাস। সে অভ্যাসের কারণেই ব্যক্তি বেড়ে উঠে সে সংস্কৃতির মানুষ রূপে। সংস্কৃতি এভাবেই সমাজে নীরবে কাজ করে। মুসলিম সমাজ থেকে সৎ নামাযী ও রোযাদারের পাশাপাশী আপোষহীন মোজাহিদ বের হয়ে আসে তা তো সংস্কৃতির সে ইন্সটিটিউশন সক্রিয় থাকার কারণেই। যেখানে সেটি নেই, বুঝতে হবে সেখানে সে পূণ্যময় সংস্কৃতিও নাই।

মুসলমানদের শক্তির মূল উৎস তেল-গ্যাস নয়, জনশক্তিও নয়। সে শক্তি হলো কোরআন ভিত্তিক দর্শন ও সে দর্শন-ভিত্তিক সংস্কৃতি। এজন্যই শত্রুপক্ষের আগ্রাসনের শিকার শুধু মুসলিম দেশের ভূগোল নয়, বরং মূল টার্গেট হলো ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতি। তাই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বাংলাদেশের মত দেশে বোমা বা যুদ্ধ বিমান নিয়ে হাজির হয়নি। হাজির হয়েছে সাংস্কৃতিক প্রকল্প নিয়ে। বাংলাদেশের হাজার হাজার এনজিওর উপর দায়িত্ব পড়েছে সে প্রকল্পকে কার্যকর করা। দেশের সংস্কৃতিকে তারা এভাবে ইসলামের শিক্ষা ও দর্শন থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছে। রাস্তায় মাটি কাটা ও তুত গাছ পাহাড়া দেওয়াকে মহিলার ক্ষমতায়ন বলে এসব এনজিওগুলো তাদেরকে বেপর্দা হতে বাধ্য করছে। অপর দিকে মাইক্রো ক্রেডিটের নামে সাধারণ মানুষকে সূদ দিতে ও সূদ খেতেও অভ্যস্থ করছে। অথচ সূদ খাওয়া বা সূদ দেওয়া –উভয়ই হলো আল্লাহতায়ালার বিধানের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। ডক্টর ইউনুসকে পাশ্চাত্য মহল নোবেল প্রাইজ দিয়েছে। সেটি এজন্য নয় যে, বাংলাদেশ থেকে তিনি দারিদ্র্য নির্মূল করছেন। বরং দেশে যতই বাড়ছে গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাক বা সূদ ভিত্তিক মাইক্রোক্রেডিট এনজিওর শাখা ততই বাড়ছে দারিদ্র্য। ডক্টর ইউনুস নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এজন্য যে, আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহ করতে তিনি অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছেন। এত বড় সাফল্য ইংরেজগণ তাদের ১৯০ বছরের শাসনেও অর্জন করতে পারেনি। ফলে শুধু নোবেল পুরস্কার নয়, এর চেয়ে কোন বড় পুরস্কার থাকলেও তারা তাকে দিত।

ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী কোয়ালিশনের মূল এজেন্ডাটি কি সেটি বুঝা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের আফগানিস্তান দখল ও সেখানে চলমান কার্যক্রম থেকে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সেখানে মুসলিম সংস্কৃতির বিনাশে হাত দিয়েছে। আফগানিস্তানের অপরাধ, অতীতে দেশটির জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের ন্যায় দুটি বিশ্বশক্তিকে পরাজিত করেছে। এবং সেটি কোন জনশক্তি, সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক শক্তির বলে নয়,

বরং ইসলামি দর্শন ও সে দর্শন-নির্ভর আপোষহীন জিহাদী সংস্কৃতির কারণে। সে অভিন্ন দর্শন ও দর্শনভিত্তিক সংস্কৃতির বলেই তারা আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্রদের পরাজিত করতে চলেছে। ফলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সে দর্শন ও সে দর্শন-ভিত্তিক সংস্কৃতির নির্মূল করতে চায়। এবং সে বিনাশী কর্মের পাশাপাশি বিপুল বিনিয়োগ করছে সে দেশে সেক্যুলার দর্শন ও সেক্যুলার সংস্কৃতির নির্মাণে। এটিকে তারা বলছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা অবকাঠামোর নির্মাণ। পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তুলছে অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আফগানিস্তানের শিশুরা এখনও নানা রোগভোগে লাখে লাখে মারা যাচ্ছে। কিন্তু তা থেকে বাঁচানোয় আগ্রহ তাদের নেই, অথচ শত শত মিলিয়ন ডলার খরচ করছে তাদের নাচগান শেখাতে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিশরের মত দেশে অতীতে একই রূপ স্ট্রাটেজী নিয়ে কাজ করেছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকেরা। এদেশগুলির উপর তাদের দীর্ঘ শাসনামলে তেমন কোন শিল্প কলকারখানা বা প্রযুক্তি গড়ে না উঠলেও তারা সে সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সেক্যুলার করেছিল। ফলে এনেছে সাংস্কৃতিক জীবনে প্রচন্ড বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি। সেক্যুলারিজমের অভিধানিক অর্থ হলো ইহজাগতিকতা। সেক্যুলারিজমের অর্থ, ব্যক্তি তার কাজ-কর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে প্রেরণা পাবে ইহজাগতিক আনন্দ-উপভোগের তাগিদ থেকে, ধর্ম থেকে নয়। এ উপভোগ বাড়াতেই সে নাচবে, গাইবে, বেপর্দা হবে, অশ্লীল নাটক ও ছায়াছবি দেখবে। মদ্যপান করবে এবং ব্যাভিচারিতেও লিপ্ত হবে। উপার্জন বাড়াতে সে সূদ খাবে এবং ঘুষও খাবে। এগুলো ছাড়া তাদের এ পার্থিব জীবন আনন্দময় হয় কি করে? তাই সেক্যুলারিজম বাড়লে এগুলো বাড়বে অনিবার্য কারণেই। অপর দিকে ধর্মপালনকে বলছে মৌলবাদী পশ্চাদ-পদতা ও গোঁড়ামী।

মুসলিম দেশে এমন চেতনা ও এমন সংস্কৃতির বৃদ্ধি পেলে জনগণের মন থেকে আল্লাহতায়ালার ভয়ই বিলুপ্ত হয়। মুসলমানগণ তখন ভূলে যায় নিজেদের ঈমানী দায়বদ্ধতা। বরং বাড়ে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবনতা। ফলে বাংলাদেশ, মিশর, পাকিস্তান বা তুরস্কের মত দেশে আল্লাহর আইন তথা শরিয়ত প্রতিষ্ঠা রুখতে কোন কাফেরকে অস্ত্র ধরতে হয়নি। সেকাজের জন্য বরং মুসলিম নামধারি সেক্যুলারগণই যথেষ্ঠ করা। কর্মা প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের জাগরণ ও মুসলিম শক্তির উত্থান রুখার লক্ষ্যে আজও দেশে দেশে পাশ্চত্যের অনুগত দাস গড়ে তোলার এটিই সফল মডেল। মার্কিন দখলদার বাহিনী সেটিরই বাস্তবায়ন করছে আফগানিস্তানে। এ স্ট্রাটেজীক কৌশলটির পারঙ্গমতা নিয়ে ব্রিটিশ শাসকচক্রের মনে কোন রূপ সন্দেহ ছিল না। যেখানে অধিকার জমিয়েছে সেখানেই এরূপ সেক্যুলারদেরকেই সযত্নে গড়ে তুলেছে। তাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাড়াতে যেখানে দেরী হয়েছে সেদেশের স্বাধীনতা দিতেও তারা বিলম্ব করেছে। সে ব্রিটিশ পলিসির পরিচয়টি মেলে মিশরে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিনিধি লর্ড ক্রোমারের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন, “কোন ব্রিটিশ উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রশ্নই উঠেনা যতক্ষণ না সে দেশে এমন এক সেক্যুলার শ্রেণী গড়ে না উঠে যারা চিন্তা-চেতনায় হবে ব্রিটিশদের অনুরূপ।” ব্রিটিশ পলিসি যে এক্ষেত্রে কতটা ফলপ্রসু হয়েছে তার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের মত সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর প্রশাসন, রাজনীতি, সেনাবাহিনী ও বিচার ব্যবস্থায় সেক্যুলার ব্যক্তিদের প্রবল আধিপত্য দেখে। আজও আইন-আদালতে ব্রিটিশের প্রবর্তিত পেনাল কোড। বাংলাদেশের সেক্যুলার সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ মুসলিম দেশের জনগণের রাজস্বের অর্থে প্রতিপালিত হলে কি হবে, দেশে যারা শরিয়ত বা আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা চায় তাদেরকে তারা ব্রিটিশদের ন্যায়ই শত্রু মনে করে। তার বিশ্বস্থ্য আপনজন মনে করে ভিন্ দেশী কাফেরদের। এদের কারণেই মুসলিম দেশে হামিদ কারজাইয়ের মত দাস পেতে ইসলামের শত্রুপক্ষের কোন বেগ পেতে হয় না।

ইসলামী দর্শন থেকে দূরে সরানো এবং মগজে সেক্যুলার চেতনার পরিচর্যাকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের মত দেশে সেক্যুলার দিনক্ষণকে ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিচ্ছে। এরই উদাহরণ, বাংলাদেশের মত দেশে বসন্তবরণ বা নববর্ষের দিন উদযাপন। নবীজীর হাদীস, মুসলমানের জীবনে বছরে মাত্র দুটি উৎসব। একটি ঈদুল ফিতর, এবং অপরটি ঈদুল আদহা বা কোরবানীর ঈদ। বাংলার মুসলমানগণ এ দুটো দিনই এতদিন ধুমধামে উদযাপন করে আসছে।

বাংলার মুসলমানদরে জীবনে নববর্ষরে উৎসব কোন কালইে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

জীবন নিয়ে একজন মুসলমানরে মূল্যায়ন আসে মহান আল্লাহর মূল্যায়ন থকে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর নিজস্ব ঘোষণাটি হলো, “তিনিই (মহান আল্লাহতায়ালা) জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করিছেনে যনে পরীক্ষা করতে পারনে তোমাদরে মধ্যে কে কর্মে উত্তম।” -সূরা মুলুক। অর্থাৎ মানুষরে জন্য এ পার্থিব জীবন পরীক্ষা-কন্দ্রে মাত্র। পরীক্ষা দিতে বসে কউে কি নাচগান করে? উৎসবে যোগ দয়ে? নাচগান বা উৎসবরে আয়োজন তো পরীক্ষায় মনযোগী হওয়াই অসম্ভব করে তোলে। নবীজীর হাদীস,“পানি যমেন শস্য উৎপাদন করে,গানও তমেনি মুনাফকেি উৎপন্ন করে।” মুনাফকেী তো ইসলামে অঙ্গকিার শূন্যতা,ঈমানরে সাথে তার আমলরে গড়মলি। তাই প্রাথমকি যুগরে মুসলমানদরে হাতে মুসলমানদরে শক্তিও মর্যাদা বাড়লওে নাচগান বাড়নে। সংস্কৃতরি নামে এগুলো শুরু হলে ঘটে বিাড়ে তা হলো পথভ্রষ্টতা। তখন সরিাতুল মোস্তাকমি পথচলাই অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই এগুলো শয়তানরে স্ট্রাটজেী হতে পারে, কোন মুসলমানরে নয়।

নতুন বছর, নতুন মাস, নতুন দনি নবীজী(সাঃ)র আমলওে ছলি। কনিতু তা নিয়ে তনিি নিজি যেমেন কোনদনি উৎসব করনেনে, সাহাবাগণও করনেনে। অথচ তারাই সর্বকালরে সর্বশ্রষ্ঠে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়তে পরেছেলিনে। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবাগান এ ব্যাপারে অতশিয় মনযোগী ছলিনে যনে শকি্ষা ও সংস্কৃতরি নামে সমাজ বা রাষ্ট্রে এমন কছিুর চর্চা না হয় যাতে সরিাতুল মোস্তাকমি চলাই অসম্ভব হয়। এবং মনযোগে ছদে পড়ে ধর্মরে পথে পথচলায়। ড্রাইভিং সটিে বসে নাচগানে মত্ত হলে সঠকি ভাবে গাড়ী চালানো যায়? এতে বচিয্যুতও বপিদ তো অনবিার্য। অবকিল সটেইি ঘটে জীবন চালনোর ক্ষত্রেওে। নবীজী(সাঃ)র আমলে সংস্কৃতরি নামে আনন্দ উপভোগরে প্রতএিত আকর্ষণ ছলি না বলইে সরিাতুল মোস্তাকমি চলা তাদরে জন্য সহজতর হয়ছেলি। বরং তারা জন্ম দয়িছেলিনে মানব-ইতহিাসরে শ্রষ্ঠেতম সংস্কৃতরি। সে সংস্কৃতরি প্রভাবে একজন ভৃত্যও খলফিার সাথে পালাক্রমে উঠরে পঠিে চড়ছেনে। এবং খলফিা ভৃত্যকে উঠরে পঠিে বসয়িে নজিে রশি ধরে টনেছেনে। সমগ্র মানব ইতহিাসে এর কোন তুলনা নইে। অথচ বাংলাদশেে আজ সংস্কৃতরি নামে কি হচ্ছে? এবারে (২০১০ সালে এপ্রলিে) ঢাকা বশি্ববদি্যালয়রে বাংলা নববর্ষরে কনসার্টে কী ঘটলো? যৌন ক্ষুধায় অতি উদভ্রান্ত অসংখ্য হায়নো কি সদেনি নারীদরে উপর ঝাপয়িে পড়নি? অসংখ্য নারী কি সদেনি লাঞ্ছতি হয়নি? কছিু কাল আগে ময়মনসংিহরে আনন্দমোহন কলজেে ব্যান্ড সঙ্গীতরে আসরে কী ঘটলো? শত শত নারী কি সদেনি ধর্ষতিা হয়ছেলি শত শত নারী। এটইি কি বাঙালী সংস্কৃতি? দশেরে সকে্যুলার পক্ষ এমন সংস্কৃতরি উৎকর্ষতা চায়?

নববর্ষ উদযাপনরে নামে নারী-পুরুষদরে মুখে উলকি কিটেে বা নানান সাজে একত্রে রাস্তায় নামানোর রীতি কোন মুসলমি সংস্কৃতি নয়। বাঙালীর সংস্কৃতওি নয়। এমনকি বাঙালী হনিদুদরেও নয়। নববর্ষে নামে বাংলায় বড়জোর কছিু হালখাতার অনুষ্ঠান হতো। কনিতু কোন কালইে এদনিে কনসার্ট গানরে আয়োজন বসনে। জন্তু-জানোয়াররে প্রতকিৃতি নিয়ে মছিলিও হয়নি। পাশ্চাত্যওে নববর্ষরে দনিে এমন উৎসব দনিভর হয় না। বাংলাদশেে এগুলীর এত আগমন ঘটছেে নছিক রাজনতৈকি প্রয়োজন। যুদ্ধজয়রে লক্ষ্যে অনকে সময় নতুন প্রযুক্তরি যুদ্ধাস্ত্র সনৈকিদরে হাতে তুলে দওেয়া হয়। অনকে সময় তাতে বজিয়ও আস। মুসলমানদরে বরিুদ্ধে পরচিালতি এ সাংস্কৃতকি যুদ্ধে সংস্কৃতরি নামে এসব অভনিব আয়োজন বাড়ানো হয়ছেে তমেনি এক ত্বড়া বজিয়রে লক্ষ্য। তাদরে লক্ষ্য নাচ-গান, কনসার্টরে নামে জনগণকে ইসলাম

থকেে দ ূরে সরানো। বপি ুল সংখ ্যক নারী-প ুর ুষ নয়িে নত ুন ঢংয়রে এসব আয়োজেন বাড়ানো হয়ছেে তমেনি এক ষড়যন ্ত ্রম ূলক প ্রয়োজেন। পাশ ্চাত ্যরে য ুবক-য ুবতীদরে ধর ্ম থকেে দ ূরে টানার প ্রয়োজেন নইে। জন ্ম থকেইে তারা ধর ্ম থকেে দ ূরে। নাচগান, মদ, অশ ্লীলতা, উলঙ ্গতা ও ব ্যভচিাররে মধ ্য দয়িইে তাদরে বড়েে উঠা। তাই নববর ্ষরে নামে তাদরে মাঝে এ সবে অভ ্যস ্থ করার প ্রয়োজেন নইে। কনি ্ত ু সটেরি প ্রয়োজেন রয়ছেে বাংলাদশে।ে সটো ধির ্ম থকেে ও নজিদেরে সংস ্ক ৃত থিকেে দ ূরে সরানোর লক ্ষ ্য।ে এসবরে চর ্চা বাড়াতে কাজ করছে প ্রচ ুর দশেী-বদিশেী এনজওি। এমন অন ুষ ্ঠানে বপি ুল অর ্থ ব ্যয়ও হচ ্ছ।ে এবং সে অর ্থ আসছে বদিশেীদরে ভান ্ডার থকে।ে এভাবে নারীপ ুর ুষরে অবাধ মলোমশোর পাশপাশ িঅশ ্লীলতারও স ুযোগ স ৃষ ্ট কিরা হচ ্ছ।ে এবং ল ুপ ্ত করা হচ্ছে ব ্যভচিার ও অশ ্লীলতাকে ঘ ৃণা করার অভ ্যাস, -যা পাশ ্চাত ্য থকেে বহ ু আগইে বলি ুপ ্ত হয়ছে।ে

শ ুধ ু বাংলাদশেে নয়, অন ্যান ্য ম ুসলমি দশেওে এর ূপ নববর ্ষ পালনে মার ্কনি য ুক ্তরাষ ্ট ্রসহ অধকিাংশ পাশ ্চাত ্য দশে বপি ুল অংকরে অর ্থ সাহায ্য দচি ্ছ।ে ইরানী-আফগানী-করিগিজী-ক ুর ্দীদরে নওরোজে উৎসবরে দনিে প ্রসেডিনে ্ট ওবামা বশিষে বানীও দয়িছে।ে তবে নববর ্ষরে নামে বাংলাদশেে ইসলামরে শত ্র ুপক ্ষরে বণিয়িোগরে মাত ্রাট িআরো বচিতি ্র ও ব ্যাপক। এখানে বানী নয়, আসছে বপি ুল বণিয়িোগ। কারণ, বাংলাদশেরে জনসংখ ্যা প ্রায় ১৫ কোট।ি আফগানসি ্তানরে চয়েে প ্রায় ৫ গ ুণ। জনসংখ ্যার ৯০% ভাগ ম ুসলমান, যাদরে আপনজনরেরা ছড়য়িে আছে ব ্শ ্বজি ুড়।ে ফলে এদশেে ইসলামরে দর ্শন প ্রচার পলেে তা ছড়য়িে পড়বে বশি ্বময়। এ বশিাল জনগণকে ইসলাম থকেে দ ূরে সরয়িে সকে ্যুলার সংস ্ক ৃততিে বশ করানো তাদরে কাছে তাই অতগি ুর ুত ্বপ ূর ্ণ। তারা চায় এ প ৃথবিীটা একট িমলে ্টংি পটে পরিণত হোক। আল ু-পটল, পংেয়াজ-মরচি যমেন চ ুলার তাপে কড়াইয়ে একাকার হয়ে যায়, তমেন িবশি ্বরে সব সংস ্ক ৃতরি মান ুষ একক সংস ্ক ৃতরি মান ুষরে পরিণত হোক। এভাবে নরি ্মতি হোক গ ্লোবাল ভলিজে। আর সে গ ্লোবাল ভলিজেরে সংস ্ক ৃত হিবে পাশ ্চাত ্যরে সকে ্যুলার সংস ্ক ৃত।ি এজন ্যই বাংলাদশেে নারী-প ুর ুষকে ভ ্যালনে ্টাইন ডে, বর ্ষপালন,মদ ্যপান, অশ ্লীল নাচ, পাশ ্চাত ্য ধাঁচরে কনসার ্টে অভ ্যস ্থ করায় এসব এনজওিদরে এত আগ ্রহ। তারা চায় তাদরে সাংস ্ক ৃতকি সীমানা বাংলাদশেরে মত ম ুসলমি দশেরে প ্রত িবসতঘররে মধ ্যওে বসি ্ত ৃত হোক। তাই বাংলাদশেরে সাংস ্ক ৃতকি সীমানা আজ বলি ুপ ্ত।

কনি ্ত ু আরো বপিদরে কারণ, এতবড় গ ুর ুতর বষিয় নয়িে ক’জনরে দ ুশ ্চনি ্তা? কোন পরবিারে কউে ম ৃত ্য ুশর ্যায় পড়লে সে পরবিারে দ ুশ ্চনি ্তার অন ্ত থাকে না। আর এখন শয ্যাশায়ী সমগ ্র বাংলাদশে ও তার সংস ্ক ৃত।ি অথচ ক’জন আলমে, ব ুদ ্ধজীবী, রাজনীতবিদি,শকি ্ষাবদি ও লখেক এ বষিয় নয়িে উদ ্বগি ্ন। ক’জন ম ুখ খ ুলছেনে বা প ্রতরিোধ গড়ে ত ুলছেনে? ১৭৫৭ সাল থকেে বাংলার ম ুসলমান ক িসামান ্যতমও সামনে এগয়িছে?ে তখন প ্রতষি ্ঠতি হয়ছেলি ব ্রটিশিরে দখলদার।ি অস ্তমতি হয়ছেলি বাংলার ম ুসলমানদরে স ্বাধীনতা। কনি ্ত ু সে পরাধীনতা বরি ুদ ্ধে কোন জনপদে, কোন গ ্রাম-গঞ ্জে কোন র ূপ প ্রতরিোধ বা বদি ্রোহরে ধ ্বন িউঠছেলি -সে প ্রমাণ নইে। বরং যে যার কাজকর ্ম নয়িে ব ্যস ্ততা থকেছে।ে দশেরে স ্বাধীনতা নয়িে কছি ু ভাবা বা কছি ু করার প ্রয়োজেনীয়তা কউে অন ুভব করনে।ি অথচ শত ্র ুর হামলার ম ুখে প ্রতরিোধরে এ দায়ভার প ্রতট িম ুসলমানর।ে এ কাজ শ ুধ ু বতেনভোগী সনৈকিরে নয়। প ্রতট িনাগরকিরে। ইসলামে এট জিহিাদ। ম ুসলমানদরে গৌরব কালে এজন ্য কোন সনোনীবাস ছলি না। প ্রতট িগ ৃহই ছলি সনোনীবাস। প ্রতট িয ুদ ্ধে মান ুষ স ্বচে ্ছায় সখোন থকেে নজি খরচে য ুদ ্ধে গয়িে হাজরি হয়ছে।ে এবং সখোনে অর ্থরে খরচ, শ ্রমরে খরচ ও রক ্তরে পশে করছে।ে অথচ আজ সনোনীবাসরে পর সনোনীবাস বড়েছে অথচ শত ্র ুর হামলার ম ুখে কোন প ্রতরিোধ নইে। দশেরে পর দশে তাই অধকি ৃত। এবং অধকি ৃত ম ুসলমি দশেরে সাংস ্ক ৃতওি।

সাংস্কৃতিক সীমানা রক্ষার লড়ায়ে পরাজিত হলে পরাজয় অনিবার্য হয় ঈমান-আকীদা রক্ষার লড়ায়েও। কারণ, মুসলমানের ঈমান-আকীদা কখন অনৈসলামিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠে না। মাছের জন্য যেমন পানি চাই, ঈমান নিয়ে বাঁচার জন্যও তেমনি ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি সংস্কৃতি চাই। মুসলমান তাই শুধু কোরআন পাঠ ও নামায-রোযা আদায় করেনি, ইসলামি রাষ্ট্র এবং সে রাষ্ট্রে শরিয়ত ও ইসলামি সংস্কৃতিরও প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলমানদের অর্থ, রক্ত, সময় ও সামর্থের সবচেয়ে বেশী ভাগ ব্যয় হয়েছে তো ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির নির্মানে। নামায রোযার পালন তো কাফেরের দেশেও সম্ভব। কিন্তু ইসলামী শরিয়ত ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্যা তথা ইসলামী বিধানের পূর্ণ পালন কি অমুসলিম দেশে সম্ভব? অতীতের ন্যায় আজকের মুসলমানদের উপরও একই দায়ভার। সেটি শুধু কলম-সৈনিকের নয়, প্রতিটি আলেম, প্রতিটি শিক্ষক, প্রতিটি ছাত্র ও প্রতিটি নাগরিকের উপরও। এ লড়ায়ে তাদেরকেও ময়দানে নেমে আসতে হবে। এ লড়াই হতে হবে কোরআনী জ্ঞানের তরবারী দ্বারা। নবীজী (সাঃ)র যুগে সেটিই হয়েছে। ইসলামে জ্ঞানার্জনকে এজন্যই নামায-রোযার আগে ফরয করা হয়েছে। কিন্তু সে ফরয পালনের আয়োজনই বা কোথায়? অনেকেই জ্ঞানার্জন করছেন নিছক রুটিরুজির তালাশে। ফরয আদায়ের লক্ষে নয়। প্রচণ্ড শূণ্যতা ও বিচ্যুতি রয়েছে জ্ঞানার্জনের নিয়তেই। ফলে সে জ্ঞানচর্চায় তাদের রুটি-রুজী জুটছে ঠিকই, কিন্তু সে জ্ঞানার্জনে ফরয আদায় হচ্ছে না। এবং জিহাদের ময়দানে বাড়ছে না লোকবল। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য এটি এক বিপদজনক দিক। আগ্রাসী শত্রুর হামলার মুখে অরক্ষিত শুধু দেশটির রাজনৈতিক সীমান্তই নয়, বরং প্রচণ্ড ভাবে অরক্ষিত দেশের সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক সীমান্তও। দেশে তাই দ্রুত ধেয়ে চলছে সর্বমুখি পরাজয় ও প্রচণ্ড বিপর্যয়ের দিকে।